শিক্ষা সমাজ দেশ

দেশ সংস্কারের পাদটীকা

– অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

সরকারি অনেক বিভাগের সংস্কার সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট তৈরি শেষ হতে চলেছে। আমরা অপেক্ষায় আছি। শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। কতটুকু ভালো হবে, সেখানেই সন্দেহ। 'সংস্কার' শব্দটা অনেকে যত সহজভাবে উচ্চারণ করেন, আমি কিন্তু অসুবিধায় পড়ে যায়। বানানটাও বিদঘুটে। বানানে 'ষ' হবে, না 'স' হবে– এ ঘোর আজও পর্যন্ত আমার গেল না। তবুও অনেক বছর পর এবার অনেক জায়গায় শব্দটি অনেকবার লিখেছি। সংবিধান সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার নিয়ে অনেক হেদায়েতি বয়ানও পত্রিকায় লিখে পেশ করেছি, সরাসরিও পাঠিয়েছি। আমার হেদায়েত-বার্তা সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিটির পছন্দ হবে, এখনো বোধগম্য নয়। শুনে একটা বিষয় ভালো লেগেছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 'মার্কা' না থাকার প্রস্তাব। বিষয়টা পরিষ্কার হয়নি। জানার বিষয় আছে, রাজনৈতিক দলের নামটা প্রার্থীর নামের সাথে থাকবে কি না? আমি লিখেছিলাম, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়া প্রয়োজন। 'পরণেওয়ালা ভালো জানে, জুতাটা কোথায় বিঁধছে'। আমি গ্রাম-গঞ্জের মানুষ বিধায় বাস্তবতা বুঝেই বলেছিলাম– চাল-গম, সুযোগ-সুবিধা বণ্টন ও গ্রাম্য সালিসে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব দেখে। এতে সমাজ পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে সমাজ ভরে গেছে। জনসাধারণকে রাজনীতি-সচেতন করতে গিয়ে রাজনীতির বিকৃত রূপ বিয়ে বাড়িতে, বাসর ঘরে, ক্ষেতে-খামারে, এমনকি গরুর হাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজকাল তো রাজনৈতিক স্থানীয় সরকারের কর্মে পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও টাকার গন্ধ শোঁকা পুরোদমে চলছে। কোথাও আটকে গেলে উপরমহলের দলীয় লোকজন রক্ষা করে। 'তুমভিও কাঁঠাল খাইয়া, হামভিও কাঁঠাল খাইয়া'। কর্মের মাঠে, অফিস-আদালতে দল পরিবর্তন হয়েছে, টেবিলের পেছনে মানুষ তো কেউ না কেউ আছে; সিস্টেমও রয়ে গেছে। নির্দলীয় নির্বাচন, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ছাড়া এসব কায়েমি বন্দোবস্ত থেকে নিস্তার পাওয়া অনেক দুরূহ। শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়াও এক্ষেত্রে কল্পিত ধারণাই থেকে যাবে।

কোনো রাজনীতিকের মুখে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে' এবং 'নেতা-কর্মীদের মধ্যে সততা থাকতে হবে' –এমন কথা কি ঘুণাক্ষরেও শোনা যায়? আসলে 'নড়ে বড়োসড়ো, কিন্তু বোঁটা শক্ত বড়'। এদেশে খুব কম রাজনীতিক আছেন যাদের মধ্যে 'সততা' শব্দটা অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে। ছোট-বড় অধিকাংশ নেতা-কর্মীর কেউই আদর্শের কারণে রাজনীতি করেন না; মুখে যা-ই বলুক, ধান্দা ভিন্ন। মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতার ভাগিদার হওয়া ও আর্থিক সুবিধার মালিক হওয়া। বুঝি, দীর্ঘদিনে অভ্যস্ত দুর্নীতির এ মচ্ছব থেকে সহজে পরিত্রাণ পাবার নয়। কামার যা গড়ে, মনে মনে গড়ে; গড়ার পরে বোঝা যায়– কি হলো। এ নিয়ে বেশি কথা বললে কোনো কোনো পক্ষ হেই হেই করে তেড়ে আসতে পারে, তখন জীবন বাঁচানো দায়। আমরা কাজে দেখতে চাই। কাজেইবা কতটুকু দেখবো অনুমান করতে পারি। উঠন্তি মূলো তো পত্তনেই মোটামুটি চেনা যায়। আমাদের স্বভাব হলো, 'পরের বেলায় মুচকি হাসি, নিজের বেলায় চুপটি আসি'। সে জন্যই সংস্কারের ফল নিয়ে ধন্দের মধ্যে আছি। একমাত্র দলীয় জবাবদিহিতা ও আইনগত দায়বদ্ধতা চলতি এ অবস্থা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারে। সে কাজ সংস্কারের মধ্যে কতটুকু হচ্ছে?

রাজনৈতিক সংস্কারে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার কথা অনেক পত্রিকায়ও লিখেছিলাম। আমার দৃষ্টিতে এটাই সংস্কারের একটা প্রধান দফা হওয়া উচিৎ। একটা বড় দলে জেলা-উপজেলা, গ্রামে-গঞ্জের নেতা-কর্মীদের নীতি-নৈতিকতা না থাকলে শুধু বড় নেতার মুখের হুমকীতে অকাজ-কুকাজ থেকে কাউকে নিবৃত করা যায় না। আমরা এ যুগে রাজনীতির মাঠে খেলতে সাথে নিই পরীক্ষিত দুর্নীতিবাজ, সোস্যাল টাউটদের; আবার কাজ চাইবো সমাজসেবা ও ত্যাগের মহত্ত্ব– তা কি হয়? 'ছাগল ধরিয়া যদি বলো কানে কানে, চরিতে না যেও বাবা ফলের বাগানে'; কোনো কাজ হবে কি? যেমন স্বভাব ও প্রশিক্ষণ, কাজও তেমন হবে। আমার এসব কথা তো আধুনিক (?) সমাজে বস্তাপচা উপদেশ। তাছাড়া রাজনীতির সেরা পদে পর পর দু'বার একই পদে কেউ থাকলেন, কী থাকলেন

না, এতে কিছু আসে-যায় না; প্রভাব অতি সামান্য। পরবর্তী সময়ে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার ওজর-আপত্তির অভাব হবে না। প্রয়োজন ক্ষমতায় থাকাকালীন জবাবদিহিতা। কার কাছে? অরাজনৈতিক পেশাজীবী নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে, বা রাষ্ট্রপ্রধানদের একটা টিমের কাছে। আমি রাষ্ট্রপ্রধান একজনকে না নির্বাচিত করে একটা 'কমিটি'কে নির্বাচনের কথা আগ থেকেই বলে আসছি। অরাজনৈতিক কমিটি হলে ভালো হয়। কমিটির নাম দিয়েছিলাম 'সুপ্রিম কাউন্সিল; অন্য নামও হতে পারে। কারণ রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে যে দল সরকার গঠন করবে, সে একই দল থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এতে ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান দলনিরপেক্ষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত টিমের জন্য অরাজনৈতিক পেশাজীবীদের মধ্য থেকে নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপ্রধান একজনের তুলনায় একটা কাউন্সিল হলেই দায়িত্ব সুনিশ্চিত করা সহজ। এ ছাড়া মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার থেকে বেরিয়ে আসাটাই সংগত।
যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য কিসিমের বড় রাষ্ট্র হলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চলতো, এত ছোট্ট দেশে এ ধরনের আইনসভা ও প্রদেশ-বিভক্তি যুতসই হবে না। আবার জগাখিচুড়ি শুরু হবে। অনন্তকাল 'ট্রায়াল এন্ড এরোর' চলতে থাকবে। এর তুলনায় 'সুপ্রিম কাউন্সিল'-এর ধারণা অনেক উন্নত এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলবাজি, দেশবিক্রির অন্তরস্থিত খায়েস, দুর্নীতির মহোৎসব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অনেক সহজ। নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এ কাউন্সিলের হাতে দেওয়া যেতে পারে। নইলে ১৫ বছর ধরেই তো দেখলাম, সব বিভাগে নিরঙ্কুশ রাজনীতি ঢুকিয়ে একাকার করে ফেলা হয়। এ পদ্ধতি অন্য কোথাও নেই, এই অজুহাত ধোপে টেকে না। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর ধারণাও তো অন্য কোথাও ছিল না; আমরা এখন তা প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি না! দল যত বড়ই হোক, জেলা-উপজেলা ও গ্রাম-গঞ্জের নেতা-কর্মীদের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নেতাদের দলীয়ভাবে বহন করতেই হবে। আবার দলীয়ভাবে অপকর্মের জবাবদিহিতা রাষ্ট্রের কাছে করতে হবে। মূলত অপরাজনীতি, 'চাটার দল' নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যত মজবুত হবে, দেশ তত ভালো চলবে, কারো ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই; বাস্তবতা তাই বলে। নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়নের নামে এমপিদের মাধ্যমে আর্থিক বিলি-বণ্টন, কর্মীদের নিয়ে ভাগাভাগি রহিত করতে হবে। শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন দেশ গড়তে ব্যর্থ হবে; আগেও আমরা তা দেখেছি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য দেশ। নাগরিক হিসেবে সবার সমান অধিকার। মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা সংবিধান থেকে উঠিয়ে দেওয়াই যৌক্তিক। আমি বাংলা ভাষার ছাত্র নই বটে; তবে সব অভিধানই শব্দটিকে ধর্ম না-বোধক বোঝায়। এর পরিবর্তে 'ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংসা' শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে। মূলনীতিতে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটাকে 'গণতন্ত্র' শব্দটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়; সাথে স্বাধীনতার তিন মূলনীতি। এদেশে পদ ও প্রার্থীতা ব্যাপকভাবে কেনা-বেচা চলছে, এ থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় কী? সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা সহজ, তবে এদেশের প্রথা অনুযায়ী মতামত কেনা-বেচা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়ে যাবে। চোখ কানা হলে যেদিকে তাকাই, সে দিকেই অন্ধকার।

এদেশে রাজনীতির নাম দুরাচারবৃত্তি, প্রতিহিংসা, ক্ষমতার দাপট ও দুর্নীতি; নাকি এসবের অপর নাম রাজনীতি– সব একাকার হয়ে গেছে। সংস্কার করে এ জঞ্জাল মুক্ত করা এতটা সহজ কথা নয়, এ থেকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। সেজন্য রাজনীতিকদের বিকৃত মানসিকতাকে সুস্থ করতে হবে। দুধ ঘোলে রূপান্তর হয়ে গেলে ঘোল থেকে মাখন পাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব না হলে সুশিক্ষিত মানুষদের নতুনভাবে রাজনীতিতে আনার বিধান করতে হবে। সংস্কারে এসব বিধানের দিকে নজর দিতে হবে। নইলে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য অর্থবহ হবে না। শুধু তাই নয়, দেশের অবস্থা বেশি খারাপ পর্যায়ে গেলে অর্জিত স্বাধীনতার অমঙ্গলও হতে পারে। কারণ আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য নতুন ভূখণ্ড ছিল না, ছিল অতীত ভূখণ্ডেরই নতুন নাম ও পতাকা এবং শোষণমুক্ত ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বুকভরা আশা। সে কাজের কতটুকু অর্জিত হলো, কাদের ও কি কারণে অর্জিত হলো না, এখন সেই জিজ্ঞাসা। 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভুত বলে পেলাম কাছে'। এখন কোথায় যাব? একাজের অগ্রগতির জন্য কোনো বিড়ালের মুখ-ভেংচিতে ভয় পেয়ে দূরে সরে গেলে হবে না। করণীয় করে যেতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের পরাজয় আমরা দেখতে চাই না। যে যেভাবেই সমালোচনা করুক, আমরা চব্বিশের আগস্টের ছাত্র-জনতার সফল আন্দোলনকে

বিপ্লবই বলবো। আমাদের কিছু ভুলের কারণে বিপ্লব আংশিক হয়ে গেছে, প্রয়োজন ছিল পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের। প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টা ও বেশ কয়েকজন উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে এখনো একে পূর্ণ বিপ্লবে রূপ দেওয়া যায়। বিপ্লবী চেতনায় দেশপ্রেমী আরো কিছু লোককে যোগ করা যায়। এ অসম্পূর্ণ বিপ্লব ব্যর্থ হলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। এজন্য এদেশের রাজনীতিকদের পরিবর্তিত ও দেশ গড়ার অনুকূল চিন্তা-চেতনা সাধারণ মানুষ আশা করে। সে দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও ঐক্য বজায় রাখতেই হবে। যে কোনোভাবে না-সূচক মন্তব্য থেকে দূরে থাকতে হবে। এত বছরের পুরোনো অভ্যাস সহজে ছাড়া যায় না; তবু ছাড়তে হবে। কারণ অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চচ্চড় করে।

চেয়েছিলাম শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা একসঙ্গে জুড়ে দিতে; উভয়টারই মান বাড়াতে, মানব-আপদকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে। উভয় শিক্ষাব্যবস্থা অন্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আলাদা করে শিক্ষায় এ জাতি-গোষ্ঠীর স্বকীয় সত্তা বজায় রাখতে। এ নিয়ে ও সামাজিক ব্যবসা নিয়ে মডেলও গড়েছিলাম। এ জনমে বাস্তবে প্রয়োগ করে যেতে পারবো না বলে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি। দেখলাম, সিলেবাস আংশিক পরিবর্তন হতে, টেক্সটও অনেকটা পরিবর্তন হতে, এসব ভালো উদ্যোগ। কিন্তু শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তন হতে দেখলাম না। তাছাড়া সামাজিক শিক্ষার তো কোনো কাঠামোই এ পর্যন্ত হয়নি। দেশের উপযোগী কাঠামো গঠন ও সার্থক বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরিই হচ্ছে মূল কাজ। এ বিষয়ে এ পত্রিকার মাধ্যমেই অনেকবার অনেক কথাই বলেছি। একই কথা বার বার বলা বেমানান। এদেশে কোনো নতুন চিন্তা-চেতনা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বিষয়টা নিয়ে ভাবার লোকের বড্ড অভাব। সামাজিক শিক্ষার উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে কী করে? এদেশের যত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক আপদ, সবই তো সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ধস ও শিক্ষাহীনতার কারণে। কথাটা তো আমরা বুঝতেই চাইনে, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে বসি। সংবিধানে স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেছিলাম। জানিনা করা হবে কিনা? পুরো শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষাব্যবস্থা কো-অর্ডিনেট করা, নীতি নির্ধারণ করা, নীতি বাস্তবায়ন করা, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষক নতুন নিয়োগ ও অযোগ্যদের বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো, শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-স্কেলের সুপারিশ করা ইত্যাদি অনেক কাজই স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে করার কথা। আমরা দেশের প্রতিটা মূল্যবান বিষয় নিয়ে বিতিকিচ্ছি অবস্থা তৈরি করি। অবশেষে ভোগান্তি সাধারণ মানুষের কাঁধে এসে ভর করে। এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

(১২ জানুয়ারি '২৫ দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদঃ সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
web: pathorekhahasnan.com